শাফিন রাশেদ এর ধারাবাহিক কিশোর উপন্যাস

‘ফাহিমের একাত্তর’

(অষ্টম কিস্তি)

কিছুক্ষণ আগে স্কুল থেকে বাসায় ফিরেছে মিল্টন।
বিশ্রাম নিয়ে কাপড় চেঞ্জ করে মাঠে যাবে খেলতে। এমন সময় একটা ছোট মেয়ে আসলো। বলল, আপনার নাম কি মিল্টন ? মিল্টন হ্যাঁ বলল। মেয়েটা মিল্টনকে বলল, সাবিহা আপা আপনাকে ডাকে।
-কোন সমস্যা ?
মেয়েটা বলল, জানি না। তাড়াতাড়ি করে সাবিহা আপার বাসায় গেল মিল্টন। দরজা খোলাই ছিল। সাবিহা আপা শুয়ে আছে। মিল্টনকে দেখে বলল, আয়।
-বস। সাবিহা আপা উঠলো না।
একটা চেয়ারে বসলো মিল্টন। আপা কোন সমস্যা ?
-দেখ, ঠিক ভাল বুঝতেছি না। তোর জানা মতে কোথাও কোন মহিলা ডাক্তার কি আছে ?

-এখন তো মনে করতে পারছি না। তবে সদর হাসপাতালে তো অবশ্যই থাকার কথা।
-আমাকে নিয়ে যেতে পারবি?
-হ্যাঁ, পারবো।
-তাহলে যা, একটা রিক্সা নিয়ে আয়।
মিল্টন বাদলকে খবর দিল। বাদলের খালাতো বোন কিছু দিন আগে ভর্তি ছিল সদর হাসপাতালে। ও চেনে অনেক কিছু।
সাবিহা বাচ্চা মেয়েটিকে নিয়ে একটি রিক্সায় উঠলো। বাদল আর মিল্টন অন্য রিক্সায়। বাচ্চা মেয়েটার কথা মনে হওয়ায় বেশ স্বস্তি পেল সাবিহা। তিন দিন আগে একজন মহিলা বাচ্চা মেয়েটিকে নিয়ে ভিক্ষা করতে এসেছে। সাবিহা মহিলাটিকে বলল, দেখুন আমার এ অবস্থা। আপনার মেয়েটিকে আমার কাছে রেখে যান। আমার ছোট বোনের মতোই থাকবে। খাবে, আমার সাথেই ঘুমাবে। সাবিহা গর্ভবতী। এইটা দেখেই সম্ভবত মহিলাটি রাজি হয়ে যায়। তবে সমস্যা হল, দুদিন পর পর মা এসে হাজির হয় মেয়েকে দেখতে। মেয়েটির নাম কৈতরী।
ইমার্জেন্সিতে একজন মধ্য বয়সী পুরুষ ডাক্তার । সব শুনলেন। গতকাল থেকে বাচ্চা নড়ছে না। সমস্যারই তো কথা।
ডাক্তার আয়াকে দিয়ে আরেক ডাক্তারকে ডাকালেন। অন্য ওয়ার্ড থেকে একজন মহিলা ডাক্তার এলেন। স্টেথোস্কোপ দিয়ে পেটে নানা ভাবে শব্দ শোনার চেষ্টা করলেন। ফাহিম ও মিল্টন সব দেখছিল দুর থেকে।
মহিলা ডাক্তার সাবিহাকে বললেন, দেখুন। সব ঠিকই আছে। কোন কারণে হয়তো কম নড়ছে। বা নড়ছে না। তবে আপনি যদি চান, আপনাকে দু একদিনের জন্য হাসপাতালে ভর্তি করতে পারি। কোন সমস্যা দেখলে সামলাতে সুবিধা হবে।
রাজি হয়ে গেল সাবিহা। সঙ্গে থাকবে কৈতরী। কথা হল, ফাহিম ও মিল্টন পরদিন বিকেলে এসে নিয়ে যাবে। ওরা চলে গেল।
রাত দশটার দিকে বাচ্চার নড়াচড়া টের পেল সাবিহা। মুহূর্তেই সব কষ্ট ভুলে গেল সে।

শনিবারের এক সকাল।
ফিরোজ রুমের মধ্যে কী যেন লিখছে। ফাহিম ও মিল্টন প্রবেশ করলো।
-কী ব্যাপার, কিছু বলবে তোমরা?
-না মানে, হ্যাঁ।
-বল। লিখতে লিখতেই বলল ফিরোজ।
-পাকিস্তানের সাথে তো যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ইন্ডিয়া কি আমাদের পক্ষে ?
-হ্যাঁ।
-কেন পক্ষে ?
-ইন্ডিয়াসহ পুরো বিশ্ব দেখছে যে, পশ্চিম পাকিস্তানিরা দীর্ঘদিন যাবত আমাদের বঞ্চিত করছে। প্রাপ্য অধিকার দিচ্ছে না। বঙ্গবন্ধু নির্বাচনে জিতলেও তাকে ক্ষমতায় বসতে দেওয়া হয়নি। বরং আমাদের শেষ করে দিচ্ছে। তাই ইন্ডিয়া আমাদের পক্ষে যুদ্ধে সহযোগিতা করছে।

-কিভাবে সহযোগিতা করছে ?

ওদের দিকে ঘুরে বসলো ফিরোজ। ওদের খাটে বসতে বলল। বলতে শুরু করলো, আমাদের দেশ থেকে প্রায় এক কোটি মানুষ ইন্ডিয়ায় শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছে। খাবার দিচ্ছ। ওরা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং দিচ্ছে। অস্ত্র সংগ্রহ করে দিচ্ছে। প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা দেশের ভিতরে এসে যুদ্ধ করছে। দেশ তাড়াতাড়ি স্বাধীন হলে ভারতের লাভ হচ্ছে এই যে, এক কোটি শরণার্থী দেশে ফিরে আসবে। তখন ভারতের দায়িত্ব অনেক কমে যাবে।

-আচ্ছা ভাইয়া, আমেরিকা চীন নাকি আমাদের বিপক্ষে ?

-আমেরিকা-চীন অস্ত্রসহ অনেক কিছু পাকিস্তানের কাছে বিক্রি করে। যদি বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায়, তবে পাকিস্তান আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে। বাণিজ্যিক সম্পর্কও দুর্বল হবে তখন। এ কারণে তারা পাকিস্তানের পক্ষে।

-আচ্ছা ভাইয়া, অনেকেই বলে, দেশ যদি স্বাধীন হয়ে যায়, তবে নাকি ভারত এদেশ নিয়ে যাবে ?

-না, এটি সত্য নয়। যারা ভারত বিরোধী, তারা এসব কথা বলে। পাকিস্তানের লোকজন এসব অপপ্রচার করছে। রাজাকার ও পিচ কমিটির লোকেরাও এসব কথা বলে। পুরো পৃথিবী দেখছে, আমরা অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করছি। আমাদের কে কেউ নিয়ে যেতে পারবে না।

-বঙ্গবন্ধু কোথায় ?

-আমার মনে হয়, উনি পাকিস্তানেই বন্দি আছেন। বঙ্গবন্ধু দেশে থাকলে আমরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে অন্তত তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেতাম।

-পাকিস্তানীরা কি বঙ্গবন্ধুর ক্ষতি করবে ?

-তা করবে না হয়তো। শত হলেও বঙ্গবন্ধু ভোটে নির্বাচিত নেতা। তাহলে বিশ্বের কাছে পাকিস্তান কি জবাব দিবে ? অনেকক্ষণ চুপ থেকে ফাহিম বলে, আচ্ছা ভাইয়া, আমাদের কি এখন উচিত নয়, অস্ত্র হাতে পাকিস্তানের বিপক্ষে যুদ্ধ করা ?

-হ্যাঁ। পারলে সেটাই ভাল। তবে সরাসরি যে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করতেই হবে বিষয়টা কিন্তু এমনও না। এই যে, আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের খবর সংগ্রহ করে দিচ্ছি, তাদের কাজ করে দিচ্ছি, তাদের খাবার দিচ্ছি, আশ্রয় দিচ্ছি, নানাভাবে সহযোগিতা করছি, এটাও কিন্তু মুক্তিযুদ্ধেরই অংশ। তোমরা কি জহির রায়হানের নাম শুনেছ?

-জীবন থেকে নেওয়া ছবির পরিচালক ?

-হুম। তিনিও কিন্তু যুদ্ধ করছেন। তবে অস্ত্র দিয়ে নয়। ক্যামেরা দিয়ে। তিনি ক্যামেরা দিয়ে শরণার্থীদের ছবি তুলছেন। যুদ্ধের ছবি তুলছেন। এটা দিয়ে প্রামাণ্য চিত্র তৈরি করছেন। বিদেশে এগুলো প্রদর্শিত হচ্ছে। এর ফলে বিশ্বের মানুষ জানছে পাকিস্তানীরা বাংলাদেশে গণহত্যা করছে। এইটাও কিন্তু যুদ্ধ। আমরা যে স্বপনকে নানা ভবে সহযোগিতা করছি, এটাও যুদ্ধে অংশগ্রহণের মতোই।

কথা শেষ করে ফিরোজ বইয়ের সেলফের কাছে গেল। টান দিয়ে একটা বই বের করল। বইটা ফাহিমের হাতে দিয়ে বলল, এটি ম্যাক্সিম গোর্কির উপন্যাস-মা। রুশ বিপ্লবে একজন সাধারণ মা অস্ত্র হাতে না নিয়ে কী ভাবে বিপ্লবীদের সাহায্য করেছিল, এখানে তা তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্বসাহিত্যের অতি উৎকৃষ্ট এবং প্রয়োজনীয় একটি বই এটি । তোমরা সবাই পড়বে ।

স্কুল শেষে যখন মিল্টন চ্যাটার্জি লেনের সামনে এলো, প্রায় তিনটা বাজে। তিন চারটা ছেলে তখন দৌড়ে একটা গলি থেকে বের হল। তারা কি যেন রাস্তায় ছুঁড়ে মারল। বিকট শব্দে কয়েকটা বোমা ফুটল। ওরা স্লোগান দিল, 'জয় বাংলা'। আবার গলির ভেতরে ঢুকে গেল।

মিল্টনের শরীরে এক ধরণের অসারতা এসে গেল। একজন চিৎকার করে বলল, এই দৌড়া। মিলিটারি রাজাকারের গাড়ি আইবে এহনি। মিল্টন দৌড়াতে থাকলো। গলির ভেতরে। ওদের বাসার দিকে। বাসার কাছাকাছি এসে নিজেদের বাসায় না ঢুকে সাবিহা আপাদের বাসায় ঢুকল মিল্টন। দুই-তিন দিন আপার খোঁজ নেয়া হয়নি।

-আয় ভিতরে আয়। সাবিহা আপা মিল্টনকে দরজা খুলে বসতে বলল ভেতরে। মিল্টনের ভেতরে তখনও উন্মাদনা। কানে বোমার শব্দ। মিল্টন সব বলল সাবিহাকে। সাবিহা শুনে খুব খুশি হল। তাহলে দেশ স্বাধীন হতে চলেছে। যখন স্বাধীন হবে দেশ। খুব আনন্দ হবে। নিশ্চয়ই পারভেজ তখন ফিরে আসবে। খুব মজা হবে। স্বামী পারভেজের কথা ভাবতেই আবার মন খারাপ হয়ে গেল সাবিহার।

আলু ভর্তা আর ডিমভাজি দিয়ে মিল্টনকে ভাত দিলো সাবিহা। ক্ষুধা ছিল। তাই আপত্তি করেনি মিল্টন। হাত ধুয়ে খেতে বসলো। দেখল আপা কষ্ট করে হাঁটছেন। পেটটাও বড়। মনে পড়লো, ডাক্তার বলেছিল, দু'তিন সপ্তাহের মধ্যেই আপার বাবু হবে।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের এক সকাল।

স্কুলে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল ফাহিম। হঠাৎ বদলের কণ্ঠ শুনতে পেল। দৌড়ে বারান্দায় গেল। বাদলের চিৎকার শুনে ফাহিম বুঝে নিল, ও কি বলতে চাচ্ছে। রাগে ফাহিমের শরীর কাঁপছে। গতরাতে শিরিন আপাদের বাসায় কারা যেন ঢুকেছিল। দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে তারা। আজগর ভাইকে খুঁজেছে। চাচা চাচীকে নির্যাতন করেছে। যাবার সময় শিরিন আপাকে তুলে নিয়ে গেছে।

মিল্টনকে ডাকে নিয়ে তিন বন্ধু মিলে ছুটল শিরিন আপাদের বাসায়। অনেক মানুষের ভীড়। মহিলাদের সংখ্যাও অনেক। সবাই প্রতিবেশী। শিরিন আপার বাবা চেয়ারে বসে আছেন। উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি। তবে ভয়ের ছাপও স্পষ্ট।

পাশের খাটে শুয়ে আছেন শিরিনের মা তাহেরা বেগম। তার অ্যাজমাটা খুব বেড়েছে। দুর থেকেই তার শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তাকে ঘিরেও মহিলাদের জটলা। চোখ বড় বড় করে তাহেরা বেগম দেখছেন সবাইকে।

ফাহিম বলল, চাচীকে হাসপাতালে নেওয়া দরকার মনে হয়। মিল্টন বলল, হ্যাঁ, নেয়া দরকার।

একটা রিক্সা ডাকল ওরা। তবে কিছুতেই হাসপাতালে যেতে রাজি হলেন না তাহেরা বেগম। বললেন, শিরিন ফিরবে কিছুক্ষণ পরেই। ওকে সামলানোর জন্য আমাকে থাকতে হবে ঘরে।

দুপুরের মধ্যে আস্তে আস্তে ঘর খালি হয়ে গেল। প্রতিবেশীরা চলে গেল যে যার কাজে। এদিকে তাহেরা বেগমের শ্বাসের শব্দ আরও বাড়তে থাকল। এক পর্যায়ে অচেতনের মতো হয়ে গেলেন

তিনি। রিক্সা আনল ফাহিমরা। রিক্সায় তোলা হল তাহেরা বেগমকে। রিক্সা ছুটল সদর হাসপাতালের দিকে।

হাসপাতালের ভর্তির দুই ঘণ্টা পর তাহেরা বেগম শ্বাস নেয়া বন্ধ করলেন। বুক চিরে আর কোন শব্দও বের হচ্ছে না।

দুইদিন পরের এক সন্ধ্যা।

বিএম স্কুলের মাঠের উত্তরপূর্ব কোনায় ফাহিমরা বসে আছে। ওদের সামনে স্বপন ও তার এক বন্ধু। দুজনের হাতেই অস্ত্র।

স্বপন বলল, ভারতের সাথে পাকিস্তানের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আমার মনে হয় পাকিস্তানী মিলিটারিরা এখন ইন্ডিয়ানদের মোকাবেলা করতেই বেশী ব্যস্ত থাকবে। এই সুযোগটা আমাদের কাজে লাগাতে হবে। শান্তিবাহিনীর লোকজন এখন আর তেমন একটা ঘর থেকে বের হয় না। রাজাকাররাও ওদের এ্যাকটিভিটি কমিয়ে দিয়েছে।

ফাহিম বলল, দাদা, শিরিন আপাকে কারা ধরে নিয়ে গেল। কোথায় নিয়ে গেল কিছু কি জানা গেছে ?

-না। তবে আমাদের ধারণা শিরিনকে রাজাকাররাই নিয়ে গেছে। এবং ওকে খুব বেশী দুরে নেবার কথাও না। হয়তো আশপাশের রাজাকার ক্যাম্পগুলোর কোন একটিতে আছে । তোমাদের এখন চোখ কান খোলা রাখতে হবে। লক্ষণ কাকার বাসার ক্যাম্পটায় তোমরা পালা করে নজর রাখো। আমি আশপাশের ক্যাম্পগুলোতে নজর রাখার ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই করেছি।

-আচ্ছা ঠিক আছে। বাদল বলল। ওরা উঠলো এরপর। স্বপন ও তার বন্ধু অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

মিল্টন স্কুলের বইখাতা নিয়ে বের হল কিন্তু স্কুলে গেল না। ও ওদের বাসার পিছনের বাগানে ঢুকলে। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এমন এক জায়গায় বসল যেখান থেকে লক্ষণ কাকার বাসার পিছনটা দেখা যায়।

মিল্টনের ধারনা শিরিন আপাকে রাজাকাররা এই বাসায় বন্দি করে রাখতে পারে। আর তা যদি হয় তাকে নিশ্চয়ই উপর তলা কিংবা নিচতলার পিছনের রুমগুলোর কোন একটিতে রাখবে। কারণ এখানেই কারো নজর পড়বে কম। পিছনের এই দিকটায় জঙ্গল।

মিল্টন জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে থাকলো। উহ্ ভয়ানক মশা এইদিকে। মশা ইচ্ছা করলেই মারা যায় কিন্তু মারছে না ও। যদি চড়ের শব্দ হয়, তাহলে ? হাত নেড়ে নেড়ে মশা তাড়াচ্ছে মিল্টন।

দুই ঘণ্টা চলে গেল। সন্দেহজনক কিছুই চোখে পরছে না। ঘরের এদিকটায় উপর ও নিচ তলায় একটা করে দরজা। দরজার দুইপাশে দু'টো জানালা। ঘরটার ফ্লোর মাটির। চৌকাঠের নিচে দুই ইঞ্চির মত ফাঁক। এই ফাঁক দিয়ে কিছুই তেমন দেখা যাচ্ছে না। তাছাড়া এদিকের ঘরগুরো অন্ধকার এখন। হঠাৎ নিচতলার মাঝের একটি ঘর যেন আলোকিত হয়ে উঠলো। চৌকাঠের নিচ দিয়ে সেই আলো টের পাওয়া যাচ্ছে। ওই দিক থেকে হঠাৎ নারী কণ্ঠের একটা চিৎকার শোনা গেল। ধস্তাধস্তির শব্দও শোনা যাচ্ছে এখন।

হলুদ রঙের কাপড় দেখা গেল হঠাৎ চৌকাঠের নিচে। সরে গেল সেই কাপড় আবার। আর্ত চীৎকার, ধস্তাধস্তি শোনা গেল। কণ্ঠটা কেমন যেন পরিচিত বলে মনে হচ্ছে। সেই মুহূর্তে দোতলায় বারান্দায়

রাইফেল হাতে এক রাজাকারকে দেখা গেল। গার্ড দিচ্ছে। রাজাকারটা তাকিয়ে আছে জঙ্গলের দিকে যেখানে মিল্টন লুকিয়ে আছে। মিল্টন ঘামছে। দেখে ফেলেনি তো ওকে।

না, অন্যদিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে রাজাকারটি। মিল্টন পিছাতে শুরু করল। না আর দরকার নেই এখানে থাকার। যা দেখার এবং যা বোঝার তা হয়ে গেছে ওর। স্বপনদাকে জানাতে হবে এখন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। কিন্তু সন্ধ্যার আগে কি পাওয়া যাবে তাঁকে ?

স্বপনদের সঙ্গে ফাহিমরা সেদিন সন্ধ্যাতেই বসল। স্কুলের মাঠের আগের জায়গায় ওরা আলোচনা করছিল। মিল্টন বলছিল, আমি নিশ্চিত না ওখানেই শিরিন আপা আছে। তবে আমার মনে হচ্ছে থাকতে পারে।

-দ্যাখ, শিরিন ওখানে আছে কি নেই এটি বড় কথা না। ওখানে এক কিংবা একাধিক মেয়ে বন্দি হয়ে আছে। তাদের উপর শারীরিক নির্যাতন চলছে। এই অবস্থায় আমরা নিশ্চয়ই বসে থাকবো না। কী করবো এবং কীভাবে করবো, এটাই এখন আলোচনার বিষয়। স্বপন এক নিশ্বাসে বলে গেল।

বাদল বলল, দাদা, যা করার আমাদের তাড়াতাড়ি করতে হবে।

-তা ঠিক। স্বপনদার সঙ্গীটি বলল। স্বপনের সঙ্গীটি এরপর মূল পরিকল্পনাটি বলল। কীভাবে এবং কখন তাও বলল ধীরে ধীরে। স্বপন সিগারেট এ টান দিল। অন্ধকার হয়ে এসেছে। এই অন্ধকারে সিগারেটের নড়াচড়া এবং একটি সম্ভাব্য উদ্ধার পরিকল্পনার কথা পরিবেশটিকে একটি আলাদা মাত্রা দিল।

ফাহিম নিজেকে আর কোন কিশোর ভাবছিল না। সে যেন এক পরিপূর্ণ যুবক। একজন মুক্তিযোদ্ধা।

(চলবে...)

শাফিন রাশেদ : লেখক ও চিকিৎসক